দৈনিক ইনকিলাব
THE DAILY INQILAB
ঢাকা : বৃহস্পতিবার, ২২ বৈশাখ ১৪২৩, ৫ মে ২০১৬

পাথর আমদানি বন্ধ করতে হবে

দৈনিক ইনকিলাবের খবরে বলা হয়েছে, মধ্যপাড়া কঠিন শিলা খনি থেকে পাথর উত্তোলন সাত মাস বন্ধ থাকার সুযোগে ভারত থেকে পাথর আমদানির হিড়িক পড়ে গেছে। পঞ্চগড়ের বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর দিয়ে প্রতিদিন পাথর বোঝাই শ' শ' ভারতীয় ট্রাক ঢুকছে বাংলাদেশে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে ট্রেনও। দর্শনা ও রহনপুর সীমান্ত দিয়ে ভারত থেকে আসছে পাথরবাহী ট্রেন। একশ' ইউনিটের বিশাল ট্রেন কমপক্ষে সাড়ে চার হাজার টন পাথর নিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করছে। প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে, পদ্মা সেতুসহ বিভিন্ন মেগা প্রকল্পে দেশীয় শিলাপাথর ব্যবহারের পথ রুদ্ধ করে পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে আমদানি করা পাথর দেশের মেগা প্রজেক্টসহ বিভিন্ন উন্নয়ন অবকাঠামোতে ব্যবহার করা হচ্ছে। এ সুযোগে দেশী-বিদেশী চক্র কোটি কোটি ডলার হাতিয়ে নিচ্ছে। বলা হয়েছে, দেশের মেগা প্রজেক্টে দেশীয় শিলাপাথর নিশ্চিত করতে শিলা উত্তোলন ত্বরান্বিত করতে একশ' কোটি টাকা প্রদানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়। সে মোতাবেক অবিকাশে টাকা পেট্রোবাংলা খনির অনুকূলে ছাড় করে। অথচ এরপরেও খনির পাথর উত্তোলন করা যায়নি। জার্মানিয়া ট্রেড কনসোর্টিয়ামের (জেটিসি) চুক্তি মোতাবেক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা এবং অনীহার কারণেই বিদ্যমান পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে।

দিনাজপুরের মধ্যপাড়া কঠিন শিলা প্রকল্পটি অনেকদিন থেকেই চক্রান্তের শিকার। ইতোপূর্বেকার প্রকাশিত খবরে দেখা যাচ্ছে, আট মাস ধরে খনির শিলা উত্তোলন বন্ধ রয়েছে। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অভাবে শিলা উত্তোলন বন্ধ থাকার অজুহাত দেয়া হয়েছে। খনি প্রকল্পের সূত্র উদ্ধৃত করে রিপোর্টে বলা হয়েছে, ছয় বছরের জন্য এক হাজার চার শ' কোটি টাকার খনির উৎপাদন, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার জন্য জেটিসিকে দায়িত্ব দেয়া হয়। দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানটির সিও একজন পাথর ব্যবসায়ী। বলা হচ্ছে, প্রতিষ্ঠানটি দায়িত্ব গ্রহণের ছয় মাসের মধ্যে তিন শিফটে কাজ করে প্রতিদিন গড়ে সাড়ে ৪ হাজার মেট্রিক টন পাথর উত্তোলন করছিল। চুক্তি মোতাবেক দায়িত্ব পালনে ঠিকাদারের অনীহা এবং অপারগতায় খনির ভূগর্ভ থেকে নতুন শিলা উৎপাদন কমতে থাকে। গত বছর সেপ্টেম্বর থেকে শিলা উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। অবশ্য,এর পেছনে যে ষড়যন্ত্র রয়েছে তা ইতোমধ্যেই আঁচ করা গেছে। নির্ভরযোগ্য সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, উক্ত প্রতিষ্ঠান খনির কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব নেয়ার পর থেকেই পেট্রোবাংলার পরিচালনা পরিষদের দুর্নীতিপরায়ণ কতিপয় কর্মকর্তা এক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। চুক্তির শর্তানুযায়ী, বাধ্যতামূলকভাবে ৬ বছরে ১২টি স্টোপ এবং ১ম ১৮ মাসে ৪টি স্টোপ নির্মাণের কথা থাকলেও ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানটি ১২ লাখ টন শিলা উৎপাদন করলেও তারা কোন স্টোপ উন্নয়ন করেনি। মূলত, পুরনো স্টোপ থেকেই পাথর উত্তোলন করেছে। এতে সংকট ঘনীভূত হয় এবং বর্তমানে বাস্তব অবস্থা হচ্ছে, আমদানিকৃত পাথরের স্তূপ জমে গেছে। প্রশ্ন হচ্ছে, আমাদের দেশে গুণগত ও মানোত্তীর্ণ কঠিনশিলা থাকা সত্ত্বেও ভারত থেকে আমদানি করতে হচ্ছে কেন? এতে এটা মনে করার সঙ্গত কারণ রয়েছে যে, একটি মহল দেশের স্বার্থবিরোধী কাজে লিপ্ত রয়েছে। একজন পাথর ব্যবসায়ীকে কিভাবে খনির দায়িত্ব দেয়া হয়েছে সে বিষয়টিও রহস্যজনক। দেশে যখন বড় বড় উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য কঠিন শিলা প্রয়োজনীয় হয়ে উঠছে, ঠিক সে সময়ই দেশীয় প্রকল্পটি স্থবির হয়ে পড়া অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ও জাতীয় স্বার্থ পরিপন্থী।

এর আগেও দেখা গেছে, নানা ছলছুঁতায় বাংলাদেশের কঠিনশিলা ব্যবহারে কোন কোন মহলের আপত্তি ছিল। এই মানসিকতার সাথে যে দুর্নীতির অভিপ্রায় জড়িয়ে আছে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। বর্তমান সময়ে সব ক্ষেত্রেই এক ধরনের লুটপাটের সংস্কৃতি চালু রয়েছে। প্রভাবশালী মহলের প্রশ্রয়ে এ প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। দিনাজপুরের কঠিনশিলা প্রকল্প নিয়ে যা ঘটেছে তার দায় কোন অবস্থাতেই সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং পেট্রোবাংলা এড়াতে পারে না। সুনির্দিষ্ট চুক্তি থাকা সত্ত্বেও কেন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান স্টোপ করেনি এবং কেন তাদের জবাবদিহিতার বাইরে রাখা হয়েছে, বিষয়টি খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। সংশ্লিষ্ট মহলকে অবিলম্বে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

জঙ্গি সন্দেহে আবারো বাংলাদেশী আটক

জঙ্গিবাদী গ্রুপের সদস্য অথবা সমর্থক সন্দেহে ৮ জন বাংলাদেশী নাগরিককে আটক করেছে সিঙ্গাপুর পুলিশ। এছাড়া আরো ৫ জনকে দেশে ফেরত পাঠিয়েছে। ইতোপূর্বে ২৭ বাংলাদেশী নাগরিককে আটক করে গত জানুয়ারী মাসে ২৬ জনকে দেশে ফেরত পাঠিয়েছিল সিঙ্গাপুর কর্তৃপক্ষ। সে সময় দেশে ফেরত পাঠানো ২৬ জনের মধ্যে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ শেষে ১২ জনকে শর্তসাপেক্ষে ছেড়ে দিয়েছিল বাংলাদেশ পুলিশ। অবশিষ্ট সন্দেহভাজন ১৪ জনের কারোর বিরুদ্ধে সন্ত্রাস বা জঙ্গিবাদে সংশ্লিষ্ট থাকার অভিযোগ অদ্যাবধি পাওয়া গেছে কিনা আমাদের জানা নেই। উন্নয়ন অংশীদার, জনশক্তি রফতানী ও দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ও সিঙ্গাপুর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। এ কথা অনস্বীকার্য যে, সিঙ্গাপুরে অবস্থানরত হাজার হাজার বাংলাদেশী নাগরিকের বেশীরভাগই ধর্মভীরু এবং এদের একটি অংশ দাড়িটুপিধারী নামাজী মুসলমান। এও অনস্বীকার্য যে, পশ্চিমা সন্ত্রাসবিরোধী সামরিক আগ্রাসনের বিপরীতে বিশ্বের মুসলমানদের মধ্যে কিছু উগ্রপন্থী-জঙ্গিবাদী গ্রুপের সৃষ্টি হয়েছে। আল-কায়েদা বা আইএস'র মত জঙ্গি গ্রুপের সৃষ্টি এবং টিকিয়ে রাখার পেছনে পশ্চিমাদের মদদ থাকার অভিযোগও নতুন নয়। আর এসব জঙ্গি গ্রুপের সাথে সংশ্লিষ্টতার সন্দেহভাজন হিসেবে সারাবিশ্বে প্রতিদিন হাজার মুসলমানকে নানা ধরনের হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। সরকারের পক্ষ থেকে সব সময়ই বাংলাদেশে আল-কায়েদা বা আইএস'র কোন কার্যক্রম নেই বলে দাবি করা হচ্ছে। মাঝে মধ্যে যাদের জঙ্গি সন্দেহে আটক করা হচ্ছে তারা কতটা জঙ্গিবাদে সংশ্লিষ্ট তা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত নয়।

সিঙ্গাপুরের স্ট্রেইটস টাইমস পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে গতকাল বাংলাদেশের সংবাদপত্রে প্রকাশিত রিপোর্টে এবারে জঙ্গি সন্দেহে আটককৃতদের বিরুদ্ধে যে সব তথ্য প্রকাশিত হয়েছে তা, ভয়াবহ। অবশ্য সিঙ্গাপুর কর্তৃপক্ষ স্বীকার করেছে, সিঙ্গাপুরে কোন নাশকতার পরিকল্পনা এদের ছিল না। তবে সিরিয়ায় গিয়ে জঙ্গিগোষ্ঠী আইএস'এ যোগ দেয়া এবং বাংলাদেশে এসে সরকার উৎখাতের লক্ষ্যে নিরাপত্তা বাহিনী এবং সরকারী কর্মকর্তাদের তালিকাভুক্ত সদস্যদের টার্গেটেড কিলিং-এ অংশ নেয়ার যে তথ্য পাওয়া গেছে তা' সত্যিই উদ্বেগজনক। আটককৃতরা সত্যিই এসব কর্মকাণ্ড ও নাশকতা পরিকল্পনার সাথে জড়িত, নাকি ভিন্ন কোন গোষ্ঠীর ফলস ফ্লাগ অপারেশনের শিকার, তা' তদন্ত করে খুঁজে বের করার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট অভিযোগকারী সংস্থার। গত ২৯ এপ্রিল দেশে ফেরত পাঠানো ৫ সন্দেহভাজনকে ইতিমধ্যেই ঢাকা থেকে আটক করেছে পুলিশ। আমরা আশা করি, সঠিক তদন্তের মাধ্যমে আটককৃত সন্দেহভাজনদের ভূমিকা সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যাবে।

গণতান্ত্রিক ও মাল্টিকালচারালিজমে বিশ্বাসী সমাজে নানা মত, পথ ও সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটে থাকে। সেখানে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মতপার্থক্য থাকাই স্বাভাবিক। মতপার্থক্য থেকে আল-কায়েদা বা আইএস'র মত জঙ্গিগোষ্ঠীর সমর্থক ও সক্রিয় সদস্য হওয়া যে কোন সমাজের জন্যই একটি বিপজ্জনক বার্তা বহন করে। ইসলামোফোবিয়ায় আক্রান্ত পশ্চিমা বিশ্বে যেভাবে নিরাপত্তার

মে দিবস যে বার্তা দিয়ে গেল

মোহাম্মদ আবদুল গফুর

গত রবিবার বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের স্মারক দিবস হিসেবে মে দিবস পালিত হয়ে গেল। এ উপলক্ষে বিভিন্ন রাজনৈতিক, শ্রমিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের পক্ষ থেকে সভা-সমাবেশ, শোভাযাত্রা প্রভৃতি কর্মসূচির মাধ্যমে শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত করার দাবি জানানো হয়। এসব কর্মসূচি যেসব আয়োজন করে রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে বহু দূরে অবস্থানকারী নানান সংস্থা, তেমনি আয়োজন করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত বহু সংগঠনও। ফলে এসব কর্মসূচিতে ভাষণ দান করেন এমন অনেক নেতা-নেত্রীও, যারা ইচ্ছা করলেই বঞ্চিত শ্রমিকদের ভাগ্য পরিবর্তন তথা ভাগ্য উন্নয়নকে শুধু ভাষণের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে বাস্তবে রূপদান করতে পারেন। কিন্তু তেমন কাজ তাদের ঘুণাক্ষরেও করতে দেখা যায় না। এর কারণ কি? এর কারণ কি এই যে, সে ক্ষেত্রে পরবর্তী মে দিবসে শ্রমিকদের বঞ্চনা ও দুর্দশা নিয়ে অশ্রু বিসর্জনের সুযোগ থেকে তারা বঞ্চিত হবে? একদিকে শ্রমিক সমাজের বঞ্চনা অন্যদিকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মহাক্ষমতাশালী নেতা-নেত্রীদের বঞ্চনা– কোন দিকে যাবেন ক্ষমতাসীন নেতা-নেত্রীরা? নিজেদের বঞ্চনা তো আর মেনে নেয়া যায় না। সুতরাং চিরবঞ্চিত শ্রমিকদের বঞ্চিত থাকার মেয়াদ বর্ধিত হয় স্বাভাবিক নিয়মে।

সারা বিশ্বে মে দিবস পালনের এই তোড়জোড়ের সূত্রপাত হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরের উনিশ শতকের কিছু বিয়োগান্ত ঘটনার স্মরণে। শ্রমিকরা আট ঘণ্টা কার্যদিবস, অনুকূল কর্ম পরিবেশ এবং ন্যায্য মজুরির দাবিতে আন্দোলন শুরু করাতে মালিক পক্ষ তাদের ওপর পুলিশ লেলিয়ে দেয়। প্রথম প্রথম শ্রমিকরা হটে গেলেও পরে তারা অন্যায়-নির্যাতনের বিরুদ্ধে জান কবুল করে রুখে দাঁড়ায় এবং একপর্যায়ে বেশ কিছু পুলিশকেও তাদের হাতে প্রাণ হারাতে হয়। এ জন্য একাধিক শ্রমিক নেতাকে অন্যায় বিচারে প্রাণদণ্ড দেয়া হয়। বিশ্বের শ্রমিক সমাজ এরপর থেকে এসব অন্যায়ের প্রতিবাদ, শ্রমিকদের কাজের উপযুক্ত পরিবেশ ও ন্যায্য মজুরির দাবিতে প্রতি বছর পহেলা মে তারিখে মে দিবস পালন করে আসছে। সেই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশেও মে দিবস পালিত হয়ে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। এ দিন সরকারি-বেসরকারী অফিসে ছুটি থাকে। বিভিন্ন সংস্থার পক্ষ থেকে শ্রমিকদের বঞ্চনার অবসান এবং তাদের ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত করার দাবি জানানো হয়।

আগেই বলেছি, এসব কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন এমন সব ব্যক্তি ও সংগঠন যাদের অবস্থান রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থেকে বহু দূরে। আবার এসব কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন এমন অনেক নেতা-নেত্রীও, যারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার সুবাদে ইচ্ছা করলেই শ্রমিক সমাজের সর্বপ্রকার বঞ্চনার অবসান ঘটাতে পারেন। কিন্তু এমন সৌভাগ্য দেশের শ্রমিক সমাজের হয় না। কারণ রাষ্ট্র ও সমাজের ক্ষমতাসীন ব্যক্তিরা মে দিবস উপলক্ষে শ্রমিকদের বঞ্চনার বিরুদ্ধে সুন্দর সুন্দর ভাষণ দেন, তা দেয়া একটা আনুষ্ঠানিকতা বা রেওয়াজ হয়ে গেছে বলেই। ফলে মে দিবস শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি-দাওয়া আদায়ের সংগ্রামের ঐতিহাসিক স্মারক হিসেবে পালিত হলেও আন্তরিকতাহীন অনুষ্ঠানসর্বস্বতার কারণে সমাজে এর কোনো বাস্তব প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায় না।

উনিশ শতকের প্রথম দিকে রাশিয়ায় লেনিন প্রমুখের নেতৃত্বে যে বলশেভিক বিপ্লব সংঘটিত হয় তাতে সর্বহারাদের একনায়কত্ব কায়েম করার ঘোষিত লক্ষ্যে বঞ্চিত শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াস চালানো হয়। বিপ্লব সাময়িকভাবে সফলও হয়। কিন্তু ভুল দর্শনের ভিত্তিতে সে বিপ্লব পরিচালিত হওয়ার কারণে সাত দশকের মধ্যেই বিপ্লবের মাধ্যমে সৃষ্ট সমাজতন্ত্রী সমাজের পতনযাত্রা শুরু হয় এবং পরবর্তীকালে চলেছিল। রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রের পতনের পর প্রথমে পূর্ব ইউরোপ পরে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দেশেও সমাজতন্ত্রী মতনের ব্যর্থতার পালা শুরু হয়। যদিও এসব অনেক দেশেই একমাত্র শাসক দল হিসেবে কমিউনিস্ট পার্টিই এখনো বহাল রয়েছে।

এসব দেশে সমাজতন্ত্র রাষ্ট্রব্যবস্থার ব্যর্থতার কারণ সম্বন্ধে পর্যালোচনার প্রশ্ন আসে স্বাভাবিকভাবেই। সমাজতন্ত্রী ব্যবস্থার পেছনে মার্কসীয় জীবন দর্শন মোতাবেক প্রথমে বিপ্লবের মারফত পুঁজিবাদী সমাজ উৎখাত হয়ে সর্বহারাদের একনায়কত্ব তথা সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথা এবং সর্বশেষে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হওয়ার (উইদার) পাওয়ার কথা। রাশিয়ায় দেখা গেল রাষ্ট্র উবে যাওয়ার ফলে ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠল। সমাজে সর্বহারাদের একনায়কত্বের নামে সর্বহারাদের নেতৃত্বের দাবিদার (একমাত্র বৈধ শাসক দল) কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো। কমিউনিস্ট নেতাদের একনায়কসুলভ কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে জনগণের মধ্যে ধূমায়িত এই ক্ষোভেই পরবর্তীকালে সেখানে গর্বাচেভের আমলে তার প্রবর্তিত গ্লাসনস্ত ও পেরেস্ত্রয়কার মাধ্যমে কমিউনিস্ট শাসনের বিরুদ্ধে জনগণকে ক্ষোভ প্রকাশে সাহসী করে তুলে রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রী শাসনের পতন অবশ্যম্ভাবী করে তুলল।

রাশিয়ায় কমিউনিস্ট ব্যবস্থার পতন থেকে যে শিক্ষা গ্রহণের রয়েছে তা হলো সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় মানুষের বিভিন্ন মৌলিক প্রয়োজন পূরণ যেমন অপরিহার্য, তেমনি মানুষের অধিকারসমূহও বেশি দিন অপূরিত রাখা সম্ভব নয়। রাশিয়া সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান প্রভৃতি মৌলিক মানবীয় প্রয়োজন পূরণে সফল হওয়া সত্ত্বেও সে দেশে মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা তথা মানবাধিকার অস্বীকৃত থাকাতে ওই ব্যবস্থার। কোনো স্থায়ী স্থিতিশীলতা গড়ে উঠতে পারছিল না। ফলে গর্বাচেভের আমলে মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা দেয়া হলে তা সে দেশে ভেঙে পড়ে।

এর পাশাপাশি কমিউনিস্ট শাসনামলে রাশিয়ায় দীর্ঘদিন ধরে ধর্মীয় কার্যকলাপ নিরুৎসাহিত থাকার ফলেও সমাজতন্ত্রী ব্যবস্থার দ্রুত পতন অনিবার্য হয়ে পড়ে। ধর্মপ্রাণ মানুষ পার্থিব অনেক চাহিদা না মিটিয়ে ত্যাগ স্বীকার করে প্রশান্তি লাভ করে পরকালে এর প্রতিদান পাওয়ার আশায়। কিন্তু মার্কসীয় জীবন দর্শনে ধর্ম বা পরকালের কোনো গুরুত্বই দেয়া হতো না। ফলে পার্থিব জীবনে সুযোগ পাওয়ার পর সমাজতন্ত্রী সমাজে তো কারো আত্মত্যাগের কোনো প্রশ্নই উঠত না। রাসিয়ায় সমাজতন্ত্রী সমাজের দ্রুত পতনের এটাও অন্যতম কারণ।

এবার ইসলামে শ্রম ও শ্রমিকের মর্যাদা সম্পর্কে কিছু কথা। ইসলামে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের পাশাপাশি বিশ্বাস করা হয় সম্পদে সর্বাত্মক মালিকানা একমাত্র আল্লাহর। আল্লাহর সার্বভৌমত্বের আওতায় আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের শর্তযুক্ত অধিকার যেমন মানুষ ভোগ করে তেমনি বৈধভাবে অর্জিত সম্পদের বৈধ আওতার মধ্যে ভোগাধিকার মানুষের রয়েছে। সম্পদে অর্জনে যেসব পন্থা ইসলাম স্বীকৃতি দেয় তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো শ্রমের মাধ্যমে সম্পদ অর্জন। রসূলুল্লাহ (সা.) এক হাদিসে বলেছেন, আল কাছেবো হাবীবুল্লাহ অর্থাৎ দৈহিক শ্রমের মাধ্যমে জীবিকা অর্জনকারী আল্লাহর বন্ধু। সে নিরিখে আমরা বর্তমান বিশ্বের শ্রমিক সমাজের প্রতি ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারি।

রসূলুল্লাহ (সা.)-এর আমলে বর্তমান যুগের মতো বৃহৎ শিল্প-কারখানা ছিল না। তবে বর্তমান যুগের মতো কিন্তু ছোটখাটো মালিক-শ্রমিক ছিল। অধিকন্তু আগের যুগের ক্রীতদাস প্রথার ধারাবাহিকতা তখনো বিদ্যমান ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা.) ক্রীতদাস প্রথা সরাসরি বিলুপ্ত ঘোষণা করেননি। কিন্তু তিনি ক্রীতদাস প্রথার উৎস শোধ করতে না পারত একপর্যায়ে সেই ঋণগ্রহীতার ঋণদাতার কাছে নিজেদের বিক্রিকরে দিয়ে ক্রীতদাসে পরিণত হতো। ইসলাম সুদকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে দিয়ে ক্রীতদাস প্রথার প্রধান উৎসমূলই বন্ধ করে দেয়। প্রাচীনকালে একবার যে কারো ক্রীতদাস হতো তার জীবনের সর্বস্ব মালিক হয়ে যেত সংশ্লিষ্ট মালিক। সে যা হুকুম দেবে তা-ই তাকে পালন করতে হতো, তাতে তার যত কষ্টই হোক। রসূলুল্লাহ (সা.) এমনিতে দাস মুক্ত করে দেয়াকে পুণ্যের কাজ বলেছেন। তিনি আরও ঘোষণা করেন, এরা তোমাদের কারো গোলাম নয়, তারা তোমাদের কাজে সাহায্যকারী ভাই। তুমি যা খাবে তাদের সে রকম খাবার দেবে। তুমি যে ধরনের কাপড় পরবে তাদেরও পরিধানের জন্য সেরকম বস্ত্র দেবে। তুমি তাদের কাজ দেবে তাদের সাধ্যের মধ্যে। যদি এমন কাজ দাও যা তাদের সাধ্যের বাইরে তা হলে সে কাজে তুমি তাদের সাহায্য করবে। যদি এসবে তোমার না পোষায় তাহলে তাদের মুক্তি দিয়ে দেবে।

ইসলামের দৃষ্টিতে শ্রমের মর্যাদা খুব বেশি। হযরত মুহাম্মদ (সা.) মেষ চরাতেন এটা সবারই জানা। ইসলামের অনেক নবী-রসূলও বিভিন্ন রকম শ্রমে নিয়োজিত ছিলেন। ইসলাম ভিক্ষা করাকে নিরুৎসাহিত করে এবং শ্রমের মাধ্যমে জীবিকা অর্জন করে স্বাবলম্বী হতে মানুষকে উৎসাহিত করে। একবার এক দরিদ্র ব্যক্তি রসূল (সা.)-এর কাছে এসে কিছু সাহায্য প্রার্থী হয়। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার বাড়িতে এমন কিছু আছে যা এই মুহূর্তে তোমার কাজে লাগছে না। সে একখানি কম্বলের কথা বলল। কম্বলখানি আনা হলে তিনি উপস্থিতদের মধ্যে কে কম্বল কিনবে ঘোষণা দিলেন। একজন দুই দিরহাম দিয়ে ওটা কিনলেন। তিনি এক দিরহাম দিয়ে সেদিনের মতো খাবার ব্যবস্থা করতে এবং অন্য এক দিরহাম দিয়ে কুঠার কিনে জঙ্গলে গিয়ে কাঠ কেটে জীবিকা অর্জন করতে পরামর্শ দিলেন। এভাবে সে ব্যক্তি অল্প দিনের মধ্যেই স্বাবলম্বী হয়ে ওঠে।

ইসলামী জীবন দর্শনের মূল ভিত্তি তৌহিদ তথা স্রষ্টার একত্বে বিশ্বাস। হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত সকল নবী-রাসূল এই তৌহিদের বাণী প্রচার করে গেছেন। এই তৌহিদের আদর্শ মোতাবেক সব মানুষের স্রষ্টা আল্লাহ। আর আল্লাহ সব মানুষের স্রষ্টা বলে তার সৃষ্ট মানুষে মানুষে বৈষম্য করা যাবে না। সব মানুষ একে অন্যের সঙ্গে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্কে আবদ্ধ। বর্ণ, ভাষা, দেশ বা পেশার ভিত্তিতে মানুষে মানুষে যারা বৈষম্য সৃষ্টি করে তারা ইসলামের শত্রু। সেই নিরিখে মালিক-শ্রমিক ভেদাভেদ থাকার কোনো সঙ্গত কারণ নেই। শ্রমিক তার কাজ বিশ্বস্ততার সাথে সম্পন্ন করবে। মালিক তার কাজের ন্যায্য পারিশ্রমিক নিয়মিতভাবে প্রদান করবে এটাই ইসলামের বিধান।

ইসলাম মানুষের জন্য যেসব কর্তব্য নির্ধারণ করে দিয়েছে তা প্রধানত দুই ধরনের। (এক) হক্কুল্লাহ (আল্লাহর হক) যেগুলোর দ্বারা মানুষের আত্মিক উন্নতি সাধিত হয়। (দুই) হক্কুল এবাদ (বান্দার হক) এর মাধ্যমে আমরা পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র প্রভৃতি ক্ষেত্রে আমাদের ইসলাম প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করি। শ্রমিকের ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত করা আমাদের এই হক্কুল এবাদ পর্যায়ের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। এসব দায়িত্ব দুনিয়াতে পালন করে না গেলে শুধু এর কারণেই আমাদের বেহেশতে যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়তে পারে।

বর্তমান বিশ্বে মালিক শ্রমিকের সম্পর্ক শুধু এক-এক পক্ষের লাভালাভের দৃষ্টিতে বিবেচনা করা হয়। এটা অবাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির ফসল। পার্থিব জীবনে মানুষের সব কাজের বিচার যেহেতু পরকালে অবশ্যম্ভাবী তা মালিক-শ্রমিক সবার ক্ষেত্রেই নিজ নিজ দায়িত্ব কে কতটুকু পালন করল, পরকালে তার জবাবদিহিতা অবশ্যম্ভাবী। ইসলামের এই বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্বাসী হয়ে উঠতে পারলে আধুনিক বিশ্বে মালিক-শ্রমিক

> *বর্তমান বিশ্বে মালিক শ্রমিকের সম্পর্ক শুধু এক-এক পক্ষের লাভালাভের দৃষ্টিতে বিবেচনা করা হয়। এটা অবাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির ফসল। পার্থিব জীবনে মানুষের সব কাজের বিচার যেহেতু পরকালে অবশ্যম্ভাবী তা মালিক-শ্রমিক সবার ক্ষেত্রেই নিজ নিজ দায়িত্ব কে কতটুকু পালন করল, পরকালে তার জবাবদিহিতা অবশ্যম্ভাবী। ইসলামের এই বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্বাসী হয়ে উঠতে পারলে আধুনিক বিশ্বে মালিক-শ্রমিক সম্পর্কের সব সমস্যা থেকে আমরা সহজেই মুক্তিলাভ করতে পারতাম। অবশ্য সে জন্য সুবিধাভোগী পক্ষ হিসেবে মালিক পক্ষকেই অগ্রণী ভূমিকা পালনে এগিয়ে আসতে হবে এবং তাদের অধীনস্থ শ্রমিকরাও যে তাদের ভাই তা উপলব্ধি করতে হবে।*

নবপত্র

হারিয়ে যাচ্ছে ঢাকার সবুজ

ফারাহ নাজ কাদের

হায়! ঢাকার সবুজ শ্যামলিমা আজ কোথায়? কোথায় তার সৌন্দর্য? এক সময় কেমন অপরূপই না ছিল ঢাকার রূপ। কয়েক বছর আগেও আমাদের প্রিয় এই ঢাকা শহর ছিল সবুজে সুশোভিত। পার্কে, সড়কের পাশে ছিল সারিবদ্ধ গাছ। অফিসগুলো ছিল ফুলগাছে শোভিত এবং বাড়িতে ছিল বাগান। আজ ২০১৬ সালে শহরে দেখছি প্রশংসনীয় সব স্থাপত্যশৈলী। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার আবাসনের জন্য নির্মিত সুউচ্চ ভবন এবং দৃষ্টিনন্দন বাণিজ্যিক টাওয়ারগুলোর সঙ্গে অতীতের সতেজ সবুজের সহাবস্থান যদি ধরে রাখা যেত তাহলে কি সুন্দর সমাহারই না হতো!

এই লক্ষ্য অর্জন কি একেবারেই অসম্ভব? পৃথিবীতে এমন অনেক উদাহরণই রয়েছে। নিউইয়র্কের ম্যানহাটানের মতো অনেক উদাহরণই পৃথিবীর সামনে রয়েছে। এমনকি দুবাইয়ের মতো মরুভূমিকেও বিস্ময়করভাবে আকাশছোঁয়া ভবন নির্মাণের মাধ্যমে বিশ্বের অন্যতম একটি বড় সমৃদ্ধ বাণিজ্যিক কেন্দ্রে পরিণত করা হয়েছে এবং গোটা শহরটি বাগানে পরিপূর্ণ করে তোলা হয়েছে। এর ফলে মরুশহরটির বিস্ময়কর রূপান্তর ঘটেছে। আর পুরস্কার বিজয়ী সিঙ্গাপুরের চেঙ্গি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর তো ইনডোর গার্ডেনের এক অনুপম আধার এবং গোটা শহরটি বিভিন্ন জাতের অর্কিড আর বাগানে পরিপূর্ণ।

তাহলে স্থাপত্যশৈলীর অগ্রগতির পাশাপাশি ঢাকার সবুজ শ্যামলিমা কেন টিকিয়ে রাখা যাবে না? নির্বিচার বৃক্ষ নিধনের বিরূপ প্রভাব ইতোমধ্যে ঢাকায় অনুভূত হওয়া শুরু হয়েছে। নগরবাসীকে রেকর্ড ভঙ্গকারী উচ্চ তাপমাত্রা সহ্য করতে হচ্ছে। গবেষকদের মতে, ঢাকা শহরের তাপমাত্রা গড়ে ৪ ডিগ্রি বেড়েছে। এতে নগরবাসীকে মারাত্মক ধকল পোহাতে হচ্ছে। গত কয়েক বছর ধরে আমাদের অসহনীয় তাপপ্রবাহে পুড়তে হচ্ছে। এটা কেবল ঢাকার নাগরিকদের জন্যই দুর্ভোগ সৃষ্টি করছে না, এমনকি আমাদের ইকোসিস্টেমের অংশ পাখ-পাখালী ও জীবজন্তুকেও তীব্র তাপপ্রবাহের ধকল সহ্য করতে হচ্ছে। এই অসহনীয় তাপমাত্রার পেছনের কারণ কি? এটা বিশ্বব্যাপী ঘটনাবলীরই ফলাফল। নিরক্ষরেখার ওপর সূর্যের সরাসরি অবস্থানের কারণে এটা ঘটছে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আমাদের অনেকেই বৈশ্বিক উষ্ণতার প্রভাব সম্পর্কে অবগত। এখন এ ধরনের ভয়াবহ পরিস্থিতির মূল কারণ কি হতে পারে? কারণ হচ্ছে, মূল বিষয়টি সম্পর্কে আমরা সচেতন নই। প্রতিদিনই বায়ুমণ্ডলে কার্বন-ডাইঅক্সাইড বাড়ছে এবং বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ কমছে। আমরা আমাদের জীবনরক্ষাকারী সম্পদ ধ্বংস করে ফেলছি। নগরায়নের নামে নির্বিচারে বৃক্ষ নিধন করে চলছি। এটা কি কোনো ভালো ফল বয়ে আনতে পারে? অথচ সূর্যের প্রখর তাপ থেকে রক্ষায় গাছ আমাদের ছায়া দেয়। পরিবেশকে শীতল রাখতে সাহায্য করে। শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি করে।

নগর ভাণ্ডারের সম্পদ বৃক্ষরাজি নিধন সম্পর্কে নগরবাসী হিসেবে আমরা বিনয়ের সঙ্গে আমাদের উদ্বেগ প্রকাশ করে আসছি। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি, পাঁচ শ' বছরের ঐতিহ্যবাহী এই শহরের বারিধারা, গুলশান-১, পূর্বাচল ও অন্যান্য এলাকায় একের পর এক বৃক্ষ নিধন হচ্ছেই। বৃক্ষ নিধন বন্ধ করা এবং ইতোমধ্যে যে ক্ষতি হয়েছ